# উত্তোরণ

শান্তিপুর মরমি

২০১৫

# সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ চাই

ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ

যোজনা কমিশন দ্বারা সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে নিযুক্ত উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল ২০১১ সালে সুপারিশ করেছিল – স্বাস্থ্যখাতে সরকারী খরচ সামান্য (জিডিপি-র ০.৫%) বাড়িয়ে সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত যোজনা কমিশন সেই সুপারিশ গ্রহণ করেনি।

গত বছর (২০১৪-র ৯ই ফেব্রুয়ারী) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেন – সরকারী হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোরের ফ্রিবেডে বিনামূল্যে অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধও পাওয়া যাবে। একবছর কেটে গেল এখনও ঘোষণা কার্যকর হয়নি।

এবছর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রের মোদী সরকার যে জাতীয় নীতি ২০১৫-র খসড়া প্রকাশ করেছে তাতেও আছে সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহের কথা। দেখা যাক, কি হয়।

আসলে ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর যে লক্ষ্য স্থির করেছিল তার জন্য চাই সবার জন্য ওষুধও। ৭০-র দশকের শেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের সপক্ষে দেশে দেশে প্রয়াস শুরু হয়।

১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণায় সই করেছিলেন আমাদের দেশের প্রতিনিধিও। কিন্তু লোক দেখানো লোক ঠকানো কিছু ঘোষণা ছাড়া কাজের কাজ কিছু এ লক্ষ্যে হয়নি বললেই চলে। ৯০-এর দশকের পর থেকে আবার শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সরকারের সরে আসা এবং বেসরকারী পুঁজির রমরমা।

আগে যে বিশেষজ্ঞ দলের কথা বলতাম, তাদের সুপারিশ না মেনে সরকার দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার তুলে দিতে চলেছে বীমাকোম্পানীগুলোর হাতে। ইতিমধ্যে আবার এক লোকঠকানো ঘোষণা-২০১৩ -এ অত্যাবশ্যক ৩৪৮টা ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিয়েছে সরকার।

বিষয়টা বোঝার জন্য ওষুধ নিয়ে কিছু ধারণা পরিস্কার করে নেওয়া যাক।

**ওষুধ একটা পণ্য**

ওষুধ একটা পণ্য, মুনাফার জন্য ওষুধ-কোম্পানী ওষুধ তৈরী করে। কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে এ পণ্যের ফারাক হল ক্রেতা (অর্থাৎ রোগী) পণ্যটাকে নিজে বাছেন না। রোগীর হয়ে পণ্যটাকে বেছে দেন অন্য কেউ অর্থাৎ ডাক্তার।

**ওষুধ একটা রাসায়নিক**

যার ব্যবহার-রোগ নিরাময়ে (যেমন-ব্যাক্টেরিয়া-সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক) বা রোগের কষ্ট কমানোয় (যেমন-উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে) বা রোগ প্রতিরোধে (যেমন-টীকাগুলো) বা রোগ-নির্ণয়ে (যেমন - এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জকের ব্যবহার) অথবা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পরিবর্তনে (যেমন - জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ)।

**সব ওষুধ কিন্তু দরকারী নয়**

১৯৭৫-এ ভারতের এক সংসদীয় কমিটি বলেছিল ১১৭টা ওষুধ দিয়ে সে সময়ের ভারতের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব। ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যে অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা বার করে তাতে ছিল ২০৮টা ওষুধ। অথচ সে সময়ে ভারতের ওষুধ বাজারে প্রায় ৬০ হাজার ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৩৭৪টা ওষুধ। ভারতের জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮। অথচ ভারতের বাজারে ওষুধ ফর্মুলেশনের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে।

**এত ফর্মুলেশন তাহলে কেন?**

একই ওষুধ আলাদা আলাদা কোম্পানী বাজার-জাত করে আলাদা আলাদা নামে। তারপর আছে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া আছে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফর্মুলেশন, যেমন - কাফ সিরাপ, হজমী ওষুধ, টনিক....।

**প্রচুর ওষুধ, মানুষের জন্য ওষুধ নেই.....**

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটা। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশ ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম তাই মোট আয়তন বেশী হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদন সত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ (৭০ থেকে ৮০%) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ যোগাতে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যায় রোগীর পরিবার।

**ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে**

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯–এই প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারী ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণীতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

| শ্রেণী | কি ধরণের ওষুধ? | লাভের হার |
|---|---|---|
| প্রথম | জীবনদায়ী | ৪০% |
| দ্বিতীয় | জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক | ৫৫% |
| তৃতীয় | অন্যান্য | ১০০% |
| চতুর্থ | নতুন ও বাকী সব ওষুধ | লাভের কোন উর্ধসীমা নেই |

ভাবা হয়েছিল এই শ্রেণী বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানীগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানীগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরী কমিয়ে দিয়ে তৈরী করতে লাগল টনিক–কাশির সিরাপের মত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা–কুষ্ঠের মত দরকারী ওষুধ অমিল হতে থাকল।

৯০–এর দশকের শুরুতে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোন ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানীগুলোর অংশের ভিত্তিতে।

২০১৩–এ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে সরকার ২০১১–র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছে। কোনও ওষুধের যে ব্র্যান্ডগুলোর বাজারে বিক্রি, সে ওষুধের বাজারে মোট বিক্রির ১% বা তার বেশী, সেই ব্র্যান্ডগুলোর দামের গড় করে ঠিক করা হচ্ছে সে ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য। তাতে কিছু ওষুধের দাম কমেছে বটে কিন্তু বেড়েও গেছে কিছু ওষুধের কমদামী ব্র্যান্ডগুলোর দাম।

যোজনা কমিশনের 'সবার জন্য স্বাস্থ্য–বিষয়ক উচ্চ–স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল কি বলেছিল –

বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখিয়েছিল স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি–র ০.৫% বাড়ালেই সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া সম্ভব।

তাঁদের মতে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্টগুলো এমন হওয়া

উচিত —

ঃঃ স্বাস্থ্যখাতে সরকারী খরচের অন্তত ১৫% হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে।

ঃঃ আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধ, হোমিওপ্যাথির আলাদা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা করতে হবে, রাজ্যস্তরে তা কেন্দ্রীয় ভাবে কিনতে হবে।

ঃঃ প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines) অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে।

ঃঃ স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হবে।

ঃঃ ভাল গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।

ঃঃ প্রত্যেক জেলায় গুদাম থাকবে।

ঃঃ ওষুধ, টীকা ও পরীক্ষার সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা চাই।

ঃঃ ওষুধের গুণবত্তা পরীক্ষার ল্যাবরেটরী নথিভুক্ত করতে হবে।

ঃঃ দ্রুত দাম মেটানোর ব্যবস্থা চাই।

**তাঁদের মতে ওষুধ, টীকা ও কারিগরী নাগালে আনতে**

ঃঃ ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ঃঃ জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে।

ঃঃ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে।

ঃঃ ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক।

**জেনেরিক নামে সব ওষুধ তৈরী হোক**

মানুষের নাগালে ওষুধকে আনতে হলে জেনেরিক নাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাড়া গতি নেই।

ঃঃ কেবল জেনেরিক নামই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।

ঃঃ বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরী প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানীগুলো বেশী সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হয়।

ঃঃ ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন ধরণের ওষুধ বোঝা সহজ নয়। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। এই বিভ্রান্তিও হয় না।

ঃঃ দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কমদামী।

ঃঃ কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হয়, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হয় না।

ঃঃ কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হয় না, খরচ কমে, ওষুধের দামও কমে।

**ওষুধ-শিল্পে পুঁজির শোষণ বন্ধ হোক**

জয়শুকলাল হাতির নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটি ১৯৭৫-এ প্রকাশিত রিপোর্ট সুপারিশ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ-কোম্পানীগুলোর বিকাশের জন্য কিছু ওষুধ-উৎপাদন কেবল দেশীয় কোম্পানীগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ-কোম্পানীগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা তৎক্ষনাৎ কমিয়ে ৪০% করা এবং তারপর কমিয়ে ২৬% করার কথা বলা হয়, এমনকি বিদেশী ওষুধ-কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাতি কমিটি।

তা হয় নি, বরং বিদেশী বিনিয়োগ বাড়তেই থাকে। আসুন আমরা দাবী তুলি হাতি কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করার।

**ওষুধের দাম প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রিত হোক**

কাঁচা মালের দাম, উৎপাদন খরচ, মোড়কের খরচ, প্রচার খরচের ওপর ১০০% লাভ রেখে ওষুধের দাম নির্ধারিত হোক - যেমনটা প্রস্তাব ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। (আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে ওষুধশিল্পকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে রসায়ন ও পেট্রোকেমিক্যাল মন্ত্রক, স্বাস্থ্য মন্ত্রক নয়)।

**সরকার সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধের যোগান দিক**

যেমনটা সুপারিশ করেছিলেন উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ-দল যেমনটা ঘোষিত হয়েছে সাম্প্রতিক জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে।

সরকারতো দান-খয়রাতি করছে না। আমাদের কাছ থেকে নেওয়া করের টাকার যথাযথ ব্যবহার করেই এমনটা করা সম্ভব।

তবে সরকারকে এমনটা করতে বাধ্য করতে গণসচেতনতা-গণআন্দোলন ছাড়া উপায় নেই।